অভিসন্দর্ভের বিষয়

বাংলা নাটকে রাজনৈতিক পটভূমি : বিশ শতকের সাতের দশক

(BANGLA NATOKE RAJNOITIK PATABHUMI: BISH SHATAKER SATER DASHAK)

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

অমর ভাণ্ডারী

বাংলা বিভাগ

মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা, ভারত

২০২৩

উপসংহার

আমাদের এই গবেষণা সন্দর্ভের মূল আলোচনার বিষয় সীমাবদ্ধ থেকেছে সাতের দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নাটককারদের ভূমিকা আলোচনার মধ্যে। এখানে আমরা দেখতে চেয়েছি নাটক কীভাবে রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত হয়ে জনগণের মধ্যে সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি করে। সাহিত্য ও শিল্পকলা একটি জাতি বা গোষ্ঠী বা সমাজের চেতনার বিবর্তনের পরিচয় দেয় এবং সেই সঙ্গে চেতনার বিবর্তনে সাহায্যও করে। ফলে সেই সাহিত্য ও শিল্পকলায় যদি রাজনীতি যুক্ত হয় এবং সেই রাজনীতি যদি প্রতিষ্ঠান বিরোধী হয়ে ওঠে তাহলে প্রতিষ্ঠানও নিজের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে তার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এখানেই প্রয়োজন পড়ে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সাহসিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার—যা আমরা বিশ শতকের সাতের দশকের নাট্যচর্চার মধ্যে খুব জোরালো ভাবেই দেখতে পাই। এই দশকের চারটি রাজনৈতিক বিষয়কে আমরা প্রাধান্য দিয়েছি—বাংলাদেশের 'মুক্তিযুদ্ধ', নকশাল আন্দোলন, রাজনৈতিক সন্ত্রাস এবং জরুরি অবস্থা। এই ঘটনাগুলিই সাতের দশকের সম্পূর্ণ রাজনীতির পরিচয় বহন করে। এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে রচিত নাটকগুলির আলোচনা করতে গিয়েই আমাদের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের নির্মাণ।

আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভে আলোচনা শুরু করেছি বাংলা রাজনৈতিক নাটকের ইতিবৃত্ত বর্ণনা দিয়ে। সাতের দশকের পূর্বে বাংলা নাটকের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলা নাটকের উৎপত্তি ঘটেছে ঔপনিবেশিক পর্বে। যখন ভারতবর্ষের মানুষ পরাধীনতার গ্লানি ভোগ করছে, স্বাধীনতার কোনও আশা বা চিহ্ন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না, সমগ্র দেশের জনগণ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে বিভক্ত এবং মধ্যযুগীয় কুসংস্কারে সমাজ আচ্ছন্ন। সেই সময় যখন সমাজসংস্কার আন্দোলন শুরু হয় তখন বাংলার নাট্য-ইতিহাসের আদিপর্বে নাটককাররা সেই আন্দোলনে নিজেদের অবদান রাখলেন একাধিক উদ্দেশ্য প্রধান নাটক রচনা করে। নাটক সমাজ পরিবর্তনের অস্ত্র হতে পারে—একথা তাঁরা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। যদিও সেসব নাটকের বেশিরভাগ নাটকেই নাটকীয় গুণ তেমন ছিল না, প্রায় সবটাই রচিত হয়েছিল একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এবং সেই উদ্দেশ্যই তাঁদের কাছে নাটকের থেকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল, তবুও নাটকের উদ্দেশ্যপ্রধান দিকটি তাঁরাই

প্রথম দেখালেন। এরপর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগে নাটককারদের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারও ভালোই বুঝতে পেরেছিল। সেজন্যই তাঁরা নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে চুপ করাতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক নাটক রচনার গতি থেমে যায়নি। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনের যুগে বাংলা নাটক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। পরবর্তীকালে প্রগতি আন্দোলন ও গণনাট্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলা রাজনৈতিক নাটকের শক্ত ভিত তৈরি হয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে, ব্রিটিশ সরকারের নির্মম শোষণকে তুলে ধরে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর শাসকের পরিবর্তন ঘটে। এখন আর শাসক বিদেশী নয়, দেশী। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীতে যখন নাটককাররা দেখল শোষণের কোনও পরিবর্তন হল না, অত্যাচার ও দমন একই রয়ে গেল তখন তারাও আর থেমে থাকলেন না। স্বাধীনতা পরবর্তী সেইসব শোষণের রূপ নাটকের মাধ্যমে তারা তুলে ধরতে থাকলেন। সাতের দশকের রাজনৈতিক নাটক এরই উত্তরসুরি। ইন্দিরা গান্ধির রাজনীতিতে, মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামে, নকশাল আন্দোলনের উত্থান-বিকাশ-পতনে, রাজনৈতিক সন্ত্রাসে, জরুরি অবস্থার একনায়কতন্ত্রে সাতের দশকের নাটককাররা নিজেদের রাজনৈতিক নাটকগুলি রচনা করেছেন।

রাজনৈতিক নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিকতার প্রশ্নে নাটককারদের ভূমিকা আলোচনা করতে বাংলাদেশের ‘মুক্তিযুদ্ধ’-কে নেওয়া হয়েছে। পশ্চিম-পাকিস্তানের কাছে দীর্ঘদিন ধরে শোষিত হয়ে শেষপর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ যখন সেই শোষণের বিরুদ্ধে এবং নিজেদের স্বাধীনতাকে বিশ্বের দরবারে মেলে ধরতে যুদ্ধে লিপ্ত হল তখন পশ্চিমবঙ্গের বাংলা নাটককাররাও নাটক রচনার মধ্য দিয়ে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, জনমত গঠন করতে সক্রিয় হলেন। সেসব নাটকে তুলে ধরলেন বাংলাদেশের বাসিন্দাদের মুক্তির স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার অদম্য ইচ্ছা ও সংগ্রাম। সেসব নাটকের নির্যাস থেকে কতগুলি বিষয় ধরা পড়ে—প্রথমত, বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রতি পাকিস্তানি শাসকের দাসসুলভ মনোভাব। পাকিস্তানিদের কাছে বাংলাদেশ ছিল একটি উপনিবেশ স্বরূপ এবং সেখানকার জনগণকে দেখেছে অত্যন্ত নিচুভাবে। প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেই পাকিস্তানি সামরিকবাহিনীর কর্মকর্তা ও অফিসাররা বাংলাদেশের নাগরিকদের অপমান করেছে, অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করেছে, বাঙালি মেয়েদের প্রতি অসামাজিক আচরণ করেছে। দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানি সেনারা নির্মমভাবে অত্যাচার চালাত, নারীদের ধর্ষণ করত তার পরিচয় নাটকগুলি বহন করেছে। উৎপল দত্তের ‘জয় বাংলা’ নাটকটি এক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানে নাজের প্রতি পাকিস্তানি সেনাদের ব্যবহার সাধারণ

দর্শকের মনে নাজের প্রতি করুণা, সেই পরিস্থিতির প্রতি আতঙ্ক এবং শত্রুর প্রতি ক্রোধ জাগিয়ে তোলে। তৃতীয়ত, পাকিস্তানের এই নির্মম শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত হতে বাংলাদেশের নাগরিকদের সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার কথা প্রত্যেকটি নাটকেই যথেষ্ট ধরা পড়েছে। এখানে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুরন্ত পদ্মা' নাটকটি সেদিক থেকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের দাবি রাখে। এখানে বাংলাদেশের আপামর জনগণের সংগ্রাম নাট্যরূপ পেয়েছে। চতুর্থত, পাকিস্তানি শাসক ও সৈন্যদের অত্যাচার ও শোষণের পাশাপাশি আর একটি বিষয় নাটকে গুরুত্ব পেতে দেখি—বাংলাদেশের জোতদার, জমিদার, মজুতদার ও পুঁজিপতিদের শোষণের দিকটিও তুলে ধরেছে। সেই সূত্রেই সাহাবুদ্দিন চৌধুরী, দবিরুল হোসেন, আমজাদ মিয়া চরিত্রগুলির নির্মাণ। এর পিছনে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয়।

নকশাল আন্দোলন গোড়ার দিকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে লড়াই করে বঞ্চিতদের অধিকার রক্ষার তাগিদেই সংগঠিত হয়েছিল। সেজন্য সমাজের বিভিন্ন মহল থেকে তাদের সমর্থনও জুটেছিল। সেরকমই এক সমর্থন পাওয়া যায় উৎপল দত্তের 'তীর' নাটকে। নাটকটি সমস্ত দিক থেকে নকশাল আন্দোলনের রাজনৈতিক দর্শনের উপর ভিত্তি করে রচিত এবং সমস্ত দিক থেকে সেই রাজনৈতিক পন্থাকে সমর্থন করে গেছে। তবে নকশাল আন্দোলন যতদিন বঞ্চিত-শোষিতদের অধিকার রক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিল ততদিন তা জনগণের পক্ষে ছিল। কিন্তু খুব শীঘ্রই এই আন্দোলন রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করতে গিয়ে হঠকারিতার পরিচয় দেয়, সাধারণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। তার 'শ্রেণিশত্রু খতম'-এর নীতি সমাজে বিশৃঙ্খলা, আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। সাতের দশকের সূচনালগ্নেই নকশাল আন্দোলন এই বিচ্যুতির শিকার হয়। ফলে এই সময় নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে নাটকগুলি রচিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে একনিষ্ঠভাবে নকশাল আন্দোলনের সমর্থন লক্ষ করা যায় না। প্রায় প্রতিটি নাটকেই নকশাল আন্দোলনের রাজনৈতিক লাইনে সাংগঠনিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা এবং প্রতিহিংসা পরায়ণ রাজনীতির সমালোচনা দেখা যায়। সেই সঙ্গে সঠিক রাজনীতির পন্থাকেও নাটককাররা তুলে ধরেছেন। নকশাল আন্দোলনকে দমন করতে রাষ্ট্র যেভাবে অতিসক্রিয়তা দেখালো তা বিশৃঙ্খলাকে কমানোর বদলে আরও তরান্বিত করেছিল। রাষ্ট্রের এই হিংসাত্মক নীতিকেও রেয়াদ করেননি কোনও নাটককার। বিচারের অপেক্ষা না রেখে রাষ্ট্রের মদতে আরও এক খতম অভিযান সংগঠিত করাও ছিল প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর পরিচয়। ফলে বেশিরভাগ নাটকে নকশাল

আন্দোলনের ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি তুলে ধরা হলেও আন্দোলনের দাবিগুলিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার কোনও নাটককারই করেননি।

ক্ষমতা দখলের লড়াইকে কেন্দ্র করে সাতের দশকের রাজনীতির উত্তপ্ত আবহাওয়ায় রাজ্য তথা দেশীয় রাজনীতিতে যে বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস জন্মালো তা সাধারণ মানুষের রোজকার জীবনকে অস্তিত্বের সংকটে ফেলে দেয়। সংসদীয় রাজনীতির নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে একাধিক প্রশ্নচিহ্ন দেখা যায়। তার উপর সরকার মদতপুষ্ট গুন্ডাদের দাপাদাপি সাধারণ মানুষের জীবনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এই সময়ের সন্ত্রাসের করাল ছায়া ও অস্থির পরিস্থিতিতে নাটককাররা প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। নাটকের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকের রূপ জন-সমাজে তুলে ধরে জনমত সৃষ্টি করে। সরকারের মদতে এক শ্রেণির জনগণ অন্য শ্রেণির দ্বারা শোষিত হচ্ছে তার রূপ এই সময়ের নাটকগুলির মধ্যে খুব স্পষ্ট। সাতের দশকের আগ্রাসী রাজনীতির সর্বোচ্চ পর্যায় জরুরি অবস্থা। একরকম আধা-ফ্যাসিবাদের উত্থান দেখা দেয় এই সময়। মানুষের অধিকারকে খর্ব করে দেশে একনায়কতন্ত্র কায়েম হল। কিন্তু নাটককাররা নিজেদের দায়িত্ব ভুলে যায়নি। সেজন্যই জরুরি অবস্থার সময় আমরা বেশ কিছু নাটক পেয়ে থাকি। সেগুলিতে প্রতিফলিত হতে দেখি রাজনৈতিক নির্যাতনকে, রাষ্ট্রের আগ্রাসী মনোভাবকে।

বাংলা রাজনৈতিক নাট্যধারার যে ঐতিহ্য, ঔপনিবেশিক যুগের পরাধীনতার গ্লানিতে যা লালিত হয়েছিল, গণনাট্যের পর্বে যা পূর্ণমাত্রায় নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছিল সেই ধারার যথাযথ উত্তরাধিকার বহন করেছে সাতের দশকের নাটককাররা। তাদের অদম্য চারিত্রিক দৃঢ়তা শাসকের রক্তচক্ষুকে ভয় পায়নি। তাদের রচিত নাটক শাসক শ্রেণির ভালোমানুষির মুখোশ টেনে খুলেছে। জনগণকে সঠিক পন্থা নির্বাচনে সহায়তা করেছে। সাতের দশকের রাজনৈতিক নাটকের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক নাটকের একটি সার্বিক রূপ ধরা পড়ে। এই সময়ের নাটককাররা নিজেদের রাজনৈতিক চেতনাকে জনমানসে পৌঁছে দিতে দুটি পন্থা অবলম্বন করেছেন। সরাসরি সমসাময়িক পটভূমিতে নাটক রচনা একটি পন্থা। এই ধারাতেই বেশি নাটক রচিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে শাসকের কোপে পড়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। সাতের দশকে এর একাধিক উদাহরণ আছে, যেগুলি আমাদের গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে। ফলে সমসাময়িক রাজনৈতিক জটিলতায় শাসকের সমালোচনা করা যখন অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, কিন্তু নাটককার নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারছেন না তখনই অবলম্বিত হয়েছে দ্বিতীয় পন্থাটি। এক্ষেত্রে নাটককাররা সরাসরি আক্রমণ না করে পরোক্ষভাবে নিজেদের রাজনীতিকে তুলে

ধরেছেন কখনও ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহার করে তো কখনও পৌরাণিক। যেমন, 'অশ্বত্থামা', 'নরক গুলজার', 'ব্যারিকেড', 'লেনিন কোথায়?'।

সাতের দশকের রাজনীতি কেবলমাত্র শোষণ, নির্যাতন, দমন ও সন্ত্রাসের নয়; সেই সঙ্গে সংগ্রামেরও বটে। যারা দীর্ঘকাল থেকে শোষিত, অবদমিত থেকে এসেছে তারা মাথা তুলে দাঁড়ানোর সাহস দেখিয়েছে এই দশকে এবং শেষপর্যন্ত স্বৈরাচারী শাসনের ক্ষণস্থায়িত্ব প্রমাণ করেছে। সময়ের এই জটিল অঙ্কের মধ্যেই সাধারণ জনগণ সংগ্রাম করে তার সমাধান খুঁজেছে। নাটককাররা সেই সংগ্রামের ভাগিদার থেকেছেন। এই দশকে নাটক নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। উৎপল দত্তের 'বিপ্লবী থিয়েটার'-এর সর্বোচ্চ পর্যায় ছিল এই দশক। এই সময়েই তাঁর রাজনীতি সম্বলিত উচ্চ মানের নাটকগুলি রচিত হয়েছে। বাদল সরকারের 'থার্ড থিয়েটার'-এর সৃষ্টি এই দশকে এসেই। তিনি নিজের দলবল নিয়ে এই সময় গ্রাম পরিক্রমায় বেরোন। গ্রামের রাজনৈতিক স্থিতি এবং সেই সঙ্গে শহরের রাজনৈতিক পঙ্কিলতা তাঁর এই পর্যায়ের নাটকগুলিতে ধরা পড়েছে। একথা এখানে উল্লেখ করতেই হয় যে এই সময় যত নাটক রচিত হয়েছিল তার বেশিরভাগটাই ছিল প্রপাগন্ডামূলক। নিছক উদ্দেশ্য সাধন এবং নিজেদের রাজনীতির প্রচার ছাড়া এগুলির আর তেমন কোনও গুরুত্ব নেই এ কথা ঠিক। কিন্তু সেই সব নাটকগুলি থেকে সময়ের জটিলতা ও রাজনৈতিক পরাঙ্মুখতা ভালোভাবেই ধরা পড়ে। এছাড়াও এই নাটকগুলি সেই সময়ের রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। তার প্রমাণও আমরা পাই। অমল রায় এই ধারারই একজন নাটককার। তাঁর একাধিক নাটক এই সময় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর আক্রমণের স্বীকার হয়েছিল। 'কলকাতার হ্যামলেট' নাটকের কাহিনিতেও আমরা এই সময়ের রাজনৈতিক নাটককারদের অবস্থার একটি নাট্যরূপ দেখতে পাই। তবে এই দশকেই 'দুরন্ত পদ্মা', 'কলকাতার হ্যামলেট', 'রাজরক্ত', 'ভোমা', 'পদাতিক', 'ব্যারিকেড', 'দুঃস্বপ্নের নগরী', 'এবার রাজার পালা', 'নরক গুলজার', 'নানা হে' ইত্যাদির মতো উচ্চমানের নাটকও রচিত হয়েছে। এগুলি যে কোনও কালেই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ধারালো অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে সক্ষম।